International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-II, Issue-I, July 2015, Page No. 21-30
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে দৃষ্টির পর্বান্তর

ড. গৌতম কুমার নাগ
সহযোগী অধ্যাপক (ফরাসী) এবং প্রধান, বিদেশী ভাষা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Our object of study is Tagore's dance drama Chitrangada which pivots on the theme of love and beauty. In the present paper we have undertaken an analysis of the vocabulary related to "eyes" or "vision" that figure in the songs and speeches of different characters of the play. We have attempted to demonstrate that through such a lexical analysis it is possible to highlight the role of eyes in different stages of development and progress of love, from the initial phase of craving for physical beauty to the stage of enlightenment where the inner eyes yearn for spiritual beauty. This study reveals an important aspect of the Tagorean conception of love and beauty.

Key Words: love, beauty, eyes, vocabulary, lexical analysis.

এই নিবন্ধে আমরা "চিত্রাঙ্গদা" নাটকে বিবৃত প্রেমের ইতিবৃত্তের বিভিন্ন পর্যায়ে দৃষ্টির ভূমিকা পর্যালোচনা করব। ইন্দ্রিয়চেতনাসঞ্জাত প্রেমে দর্শনেন্দ্রিয়ের ভূমিকা নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের নৃত্যনাট্যে আমরা একাধিকবার দেখেছি প্রথম দর্শনেই প্রেমের সঞ্চার ঘটেছে। কিন্ত "চিত্রাঙ্গদা" নাটকটি সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। প্রেম দৃষ্টির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে পরিণতি লাভ করেছে। বস্তুতঃ এই নাটকটিকে দৃষ্টির বিভিন্ন পর্বান্তরের ধারাভাষ্যরূপে অভিহিত করা যায়।

এই নিবন্ধে আমরা "চিত্রাঙ্গদা" নৃত্যনাট্যে বিভিন্ন চরিত্রের গানে বা সংলাপে ব্যবহৃত দৃষ্টিদ্যোতক শব্দাবলীর বিশ্লেষণ করব। এই তালিকায় বিশেষ্যের মধ্যে রয়েছে দর্শনেন্দ্রিয়নির্দেশক বিশেষ্য (চোখ, নয়ন, আঁখি) এবং দৃষ্টিপ্রক্রিয়ানির্দেশক বিশেষ্য (দেখা, দর্শন); ক্রিয়ার মধ্যে আছে "দেখ্","হের্" ও "চা" ধাতুনিষ্পন্ন বিভিন্ন ক্রিয়ারূপ (দেখি, দেখিলাম ... হেরো, হেরিল... চাও)। আমরা দেখব নৃত্যনাট্যের নানা মুহূর্তে এই সমস্ত শব্দের প্রয়োগে একটা অন্তর্লীন ঐক্য ফুটে উঠেছে; দেখা যাবে এই প্রয়োগের ধারাবাহিক পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে এই নাটকে প্রেমের উন্মেষ, অগ্রগতি ও পরিণতির একটা পূর্ণাঙ্গ আলেখ্য নির্মাণ করা সম্ভব।

মূল নাটকে প্রবেশ করার আগে ভূমিকাটুকু পাঠ করলে এই নাটকে দৃষ্টির স্থান কোথায় সেই সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যেতে পারে।

প্রভাতের আদিম আভাস অরুণবর্ণ আভার আবরণে
অর্ধসুপ্ত চক্ষুর 'পরে লাগে তারই প্রথম প্রেরণা।
অবশেষে রক্তিম আবরণ ভেদ ক'রে সে আপন নিরঞ্জন শুভ্রতায়
সমুজ্জ্বল হয় জাগ্রত জগতে।

তেমনি সত্যের প্রথম উপক্রম সাজসজ্জার বহিরঙ্গে,
বর্ণ বৈচিত্র্যে ---
তারই আকর্ষণ অসংস্কৃত চিত্তকে করে অভিভূত।
একদা উন্মুক্ত হয় সেই বহিরাচ্ছাদন,

তখনই প্রবুদ্ধ মনের কাছে তার পূর্ণ বিকাশ।

এই তত্ত্বটি চিত্রাঙ্গদা নাট্যের মর্মকথা।
এই নাট্যকাহিনীতে আছে---
প্রথমে প্রেমের বন্ধন মোহাবেশে ,
পরে তার মুক্তি সেই কুহক হতে
সহজ সত্যের নিরলংকৃত মহিমায়।।[১]

তিন অংশে বিভাজ্য এই ভূমিকায় নাটকের তত্ত্বকথা বিবৃত হয়েছে শেষ অংশে । ভূমিকার শুরুতে কবি একটি প্রতীকের আশ্রয় নিয়েছেন, দ্বিতীয় অংশে তারই ব্যাখ্যা। এই প্রতীক নির্মাণ দৃষ্টিকে ভিত্তি করে। ভূমিকার প্রথম দুই অংশের কেন্দ্রবিন্দু যথাক্রমে ইন্দ্রিয়দৃষ্টি এবং হৃদয়। ইন্দ্রিয়চেতনায় সূর্যকিরণরাশির সৌন্দর্যের পর্যায়ক্রমিক উন্মোচনের এবং মানবহৃদয়ে সত্যের পূর্ণপ্রকাশের বিভিন্ন স্তরগুলি এই দুই অংশে সমান্তরালভাবে আভাসিত হয়েছে। সুপ্তিজড়িমাজাল ছিন্ন করে ইন্দ্রিয়দৃষ্টির পূর্ণজাগরণের সমান্তরালে আসে "অসংস্কৃত চিত্তের" "প্রবুদ্ধ মনে" রূপান্তর। ভূমিকায় উপমান-উপমেয় সম্বন্ধে সম্পৃক্ত দৃষ্টি ও হৃদয় নাট্যকাহিনীতে উপস্থাপিত হয়েছে যাত্রাপথের দুই প্রান্তরূপে। গতিপথের সূচনা ইন্দ্রিয়দৃষ্টি থেকে, তার অভিমুখ হৃদয়।

এই নৃত্যনাট্যের প্রথম দৃষ্টিদ্যোতক শব্দের ব্যবহার চিত্রাঙ্গদার সখীর উক্তিতে। অর্জুনের প্রস্থানের পর চিত্রাঙ্গদার অপ্রত্যাশিত আকস্মিক পরিবর্তনে বিস্মিত সখীর জিজ্ঞাসা :

সখী, কী **দেখা দেখিলে** তুমি!
এক পলকের আঘাতেই
খসিল কি আপন পুরানো পরিচয়।
রবিকরপাতে কোরকের আবরণ টুটি
মাধবী কি প্রথম চিনিল আপনারে।। [২]

বিস্ময়বোধক বাক্যে "দেখ্" ধাতু নিষ্পন্ন সমাপিকা ক্রিয়া "দেখিলে" এবং সমধাতুজ কর্ম "দেখা"র সহাবস্থান। প্রথম দেখাতেই প্রেম --- যেমন অন্যান্য নৃত্যনাট্যের নায়িকাদের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। কিন্তু তুলনামূলক পর্যালোচনায় একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য ধরা পড়বে। "শ্যামা" নৃত্যনাট্যে বন্দী বজ্রসেনকে দেখামাত্রই রূপমুগ্ধ শ্যামা বলে ওঠে :

আহা মরি মরি,
মহেন্দ্রনিন্দিতকান্তি উন্নতদর্শন
কারে বন্দী করে আনে
চোরের মতন কঠিন শৃঙ্খলে। [৩]

"মায়ার খেলা" নৃত্যনাট্যে নায়ক অমরকে ঘিরে দুই নায়িকার গানে রূপমুগ্ধতার বহিঃপ্রকাশ নেই, শান্তা বা প্রমদার গানে "মহেন্দ্রনিন্দিতকান্তি" "উন্নতদর্শন" এই জাতীয় বিশেষণ নেই, কিন্তু শ্যামার মত দুজনের ক্ষেত্রেই প্রেমের উন্মেষ ঘটেছে প্রথম দর্শনেই। অমরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে শান্তার গান :

পথহারা তুমি পথিক যেন গো সুখের কাননে,
ওগো, যাও কোথা যাও।
সুখে ঢলোঢলো বিবশ বিভল পাগল নয়নে
তুমি চাও কারে চাও।[৪]

অশোক ও কুমারের প্রেম বারংবার প্রত্যাখ্যান করার পর অমরের দিকে দৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সখীদের উদ্দেশে প্রমদা বলে :

দূরে দাঁড়ায়ে আছে
কেন আসে না কাছে।
ওলো যা, তোরা যা সখী, যা শুধা গে
ওই আকুল অধর আঁখি কী ধন যাচে।[৫]

শান্তা বা প্রমদার অমরকে ঘিরে যথার্থ কোন জিজ্ঞাসা নেই, তাদের গানে সদ্য উন্মেষিত প্রেমের বহিঃপ্রকাশ। এই তিনটি ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে নায়কের সঙ্গে সাক্ষাতের পর যে গান নায়িকার কণ্ঠে শোনা গেছে সে গান প্রেমের। চিত্রাঙ্গদার ক্ষেত্রে

কিন্তু এই কথা প্রযোজ্য নয়। অর্জুনের উপস্থিতিতে উচ্ছ্বসিত আবেগে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়, সে শুধু "অর্জুন" নামটি পুনরাবৃত্তি করে। অর্জুনের প্রস্থানমুহূর্তে তার গাওয়া গানে প্রেমের আভাসটুকুও নেই। তার মধ্যে সঞ্চারিত অনুভূতি কোনভাবেই প্রেমের নয়। এই অনুভূতি রোমাঞ্চের— খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে স্থিত প্রথিতযশা ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে অনুরাগী ভক্তজনের মনে যে রোমাঞ্চের উদ্রেক হয়। এই অনুভূতি পুরুষের প্রতি নারীর সেই চিরন্তন আকর্ষণ নয়, লিঙ্গপরিচয় এইক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। এই গানে রাজপুত্ররূপে পালিত চিত্রাঙ্গদার পুরুষসত্তার কণ্ঠই শোনা যায়। অর্জুনকে সে দেখেছে বিশ্ববিজয়ী বীররূপে, এক অসম প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে। প্রণয়ীরূপে সে অর্জুনকে আহ্বান করে নি, তার সঙ্গে সে অসম যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চেয়েছে। এই দেখা তখনও প্রেমের দেখা নয়।

শ্যামা, শান্তা বা প্রমদার মত এই দেখা কেবল স্বপ্নের পুরুষের দর্শনলাভ নয়, প্রাথমিক পর্যায়ে এই দর্শন আত্মদর্শন। আজন্ম অবদমিত স্বীয় নারীসত্তাকে চিত্রাঙ্গদা প্রথম প্রত্যক্ষ করে। সখীর উক্তির শেষ অংশে, সূর্য ও মাধবীর রূপকের মধ্যে তারই ব্যঞ্জনা নিহিত রয়েছে।

অন্যান্য নায়িকাদের তুলনায় চিত্রাঙ্গদার ক্ষেত্রে প্রেমাস্পদের দর্শন এবং প্রেমসঞ্চারের মুহূর্তের মধ্যবর্তী ব্যবধান অতি সামান্য হলেও দীর্ঘতর। অন্য নায়িকারা সকলেই ছিল পূর্ণনারী। কিন্তু চিত্রাঙ্গদাকে রূপান্তরের স্তর অতিক্রম করতে হয়েছে— তার মূলে রয়েছে এই দেখা। এই দেখা প্রথমে নিজেকে নবরূপে আবিষ্কার, তারপর অর্জুনকে নবতররূপে দর্শন।

এই নাটকে দৃষ্টিদ্যোতক শব্দের দ্বিতীয় প্রয়োগ, সখীর উক্তির ঠিক পরে চিত্রাঙ্গদার গানে। এটি তার প্রথম প্রেমসঙ্গীত । অর্জুনের সঙ্গে যে দেখা প্রেমের দেখা ছিল না, যে দেখা ছিল শুধুই এক সম্মানীয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখা, সেই দেখার বিবরণ দিতে গিয়ে দৃষ্টিদ্যোতক কোন শব্দ ব্যবহৃত হয় নি। এরপর রূপান্তরের পালা— তার অভিব্যক্তি প্রথমে অভ্যস্ত ক্রিয়াকলাপে প্রবল বিতৃষ্ণায় ("থাক্, থাক্ মিছে কেন এই খেলা আর")[৬], তারপর আত্ম-উদ্দীপনা সঞ্চারের প্রচেষ্টায় ("ওরে ঝড় নেমে আয়") [৭]। তখনও কোনক্ষেত্রেই চিত্রাঙ্গদার উক্তিতে দৃষ্টিদ্যোতক শব্দ আসে নি। অবশেষে নারীসত্তার পূর্ণজাগরণের পর যখন প্রথম প্রেমের উন্মেষ ঘটল, তখনই তার গানে প্রথমবার দৃষ্টিদ্যোতক শব্দের প্রয়োগ ঘটল। অর্জুন যখন তার ধ্যানমগ্ন চেতনায় "বঁধু"রূপে ধরা দিল, তখন মুগ্ধ স্বপ্নাবেশ আচ্ছন্ন করে দিল তার দুইচোখ :

বঁধু , কোন আলো লাগল **চোখে**

এই গানের শুরুতে যেমন দৃষ্টি, শেষেও তেমনি দৃষ্টি। যেমন প্রথম কলির শেষে তেমনি শেষ কলির শুরুতেও দৃষ্টিদ্যোতক শব্দ : এবার ক্রিয়া "হেরা"। অর্জুনের ধ্যানমূর্তিটি যেমন করে তার স্বপ্নবিভোর নেত্রে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, তেমনিভাবে তার সদ্য-উন্মোচিত নারীরূপটি অর্জুনের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হোক— এই আকাঙ্ক্ষাই গানের শেষে ব্যক্ত হয়েছে। অর্জুনের উদ্দেশে তার আমন্ত্রণ :

হেরো লজ্জিত স্মিতমুখ শুভ আলোকে[৮]

এরপর অর্জুনকে প্রেমনিবেদন যখন ব্যর্থ হল, তখন অপমানের জ্বালায় জর্জরিতা চিত্রাঙ্গদা জীবনে প্রথম মদনের শরণাপন্ন হল। প্রেমের দেবতার প্রতি উপেক্ষিতা, অভিমানিনী নারীর উক্তিতে দেখা গেল "হেরা" ক্রিয়ার পুনঃপ্রয়োগ :

অর্জুন ব্রহ্মচারী
মোর মুখে **হেরিল না** নারী,
ফিরাইল, গেল ফিরে।[৯]

চিত্রাঙ্গদাকে তার অভীপ্সিত বরদান করতে মদন তাঁর উক্তিতে প্রথম দৃষ্টিদ্যোতক শব্দের প্রয়োগ করলেন : কটাক্ষ।

তাই আমি দিনু বর,
কটাক্ষে রবে তব পঞ্চম শর,
মম পঞ্চম শর—[১০]

চিত্রাঙ্গদার প্রার্থনায় ব্যবহৃত "দেহ" "তনু" "স্বর্গের মূল্য" "পুষ্পলাবণ্য" ইত্যাদি বিশেষ্যসমূহের পরিবর্তে একটি মাত্র সর্বনাম (তাই) ব্যবহার করে মদন তার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। প্রত্যাখ্যাতা রাজকন্যার সামগ্রিকভাবে প্রার্থনা ছিল দেবদুর্লভ দেহকান্তির; পৃথকভাবে দৃষ্টির উপর সে অতিরিক্ত কোন গুরুত্ব আরোপ করে নি। কিন্তু এই দৃষ্টিসৌন্দর্যের বর মদনের স্বতঃপ্রণোদিত সংযোজন। এই সংযোজন প্রেমের মায়াজাল বিস্তারে নারীর দৃষ্টিসৌন্দর্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার সঙ্কেতবাহী। মদনের উক্তি অনুসারে রমণীর বিলোল কটাক্ষ শুধুমাত্র তার শরীরী সৌন্দর্যের অঙ্গ নয়, এই কটাক্ষ তার যুদ্ধজয়ের অস্ত্র। তাই শরের চিত্রকল্পের অবতারণা। মদনের উক্তির এই অংশে অভিব্যক্ত অনুভূতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ সংশ্লিষ্ট বাক্যের নির্মিতি। এ ক্ষেত্রে সম্বন্ধপদের ব্যবহার এবং শব্দের পুনরাবৃত্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। "কটাক্ষ" ও "তব"— পরস্পরসম্পৃক্ত

বিশেষ্য ও সম্বন্ধপদ দুটিকে তাদের স্বাভাবিক স্থান থেকে বিচ্যুত করা হয়েছে এবং দুইয়ের মধ্যে একটি ক্রিয়া ("রবে") সংস্থাপনের মাধ্যমে দূরত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে। এর ফলে "তব" যেন "কটাক্ষ" থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কলির অন্তস্থিত "পঞ্চম শরের" সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। কলির একপ্রান্তে "কটাক্ষ" অপরপ্রান্তে "তব পঞ্চমশর"— কটাক্ষের মত পঞ্চমশরেরও অধিকারিণী যেন চিত্রাঙ্গদা— যে পঞ্চমশরের অধিকারী চিরাচরিতভাবে মদনদেব। তাঁর উক্তির মধ্যে যেন অধিকার হস্তান্তরের ঘোষণা। এছাড়া পঞ্চম শর আরও গুরুত্ব পেয়েছে পুনরাবৃত্তির কারণে। এই শব্দগুচ্ছের সঙ্গে দুবারই সম্বন্ধপদের ব্যবহার হয়েছে— "তব পঞ্চমশর" "মম পঞ্চমশর"। এর মধ্য দিয়ে পঞ্চম শরের উপর মদন ও চিত্রাঙ্গদার সমানাধিকারের বার্তা যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অস্ত্ররূপে নারীর কটাক্ষের এমন উপস্থাপনা এক যুদ্ধের আবহ নির্মাণের অনুকূল। যুদ্ধাস্ত্ররূপে কটাক্ষের ভূমিকা অনুধাবন করতে আমরা পূর্ববর্তী কয়েকটি মুহূর্তের পর্যালোচনা করব— এই নাটকের যে মুহূর্তগুলিতে যুদ্ধের আবহ ছিল।

যুদ্ধের আবহ ছিল অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্তে— আমরা ইতিমধ্যে সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছি। অর্জুনের প্রস্থানমুহূর্তে চিত্রাঙ্গদা তার সঙ্গে অসম যুদ্ধে লিপ্ত হতে চেয়েছিল। এই যুদ্ধেই সে অভ্যস্ত— যে যুদ্ধের মাধ্যম বাহুবল, অস্ত্রবল— সেই যুদ্ধে বীরজনোচিত মৃত্যুর গৌরবই তার কাঙ্ক্ষিত ছিল। অবশেষে পূর্ণনারীতে রূপান্তরের পর অর্জুনের কাছে আত্মনিবেদন করে যখন সে প্রত্যাখ্যাত হল তখন থেকে এক নূতনতর যুদ্ধ শুরু হল। এবার পরাজয়ের বিন্দুমাত্র বাসনা তার নেই, এই অনভ্যস্ত যুদ্ধে সে জয়লাভে কৃতসঙ্কল্প।

তার সখীর উক্তিতেও সেই ভাবনারই প্রতিফলন।এই উক্তিতে যুদ্ধের অনুষঙ্গবাহী শব্দের, বিশেষত জয়পরাজয়নির্দেশক শব্দের বাহুল্য দেখা যায় ।

ব্রহ্মচর্য ! — পুরুষের স্পর্ধা এ যে !
নারীর এ পরাভবে
লজ্জা পাবে বিশ্বের রমণী।
পঞ্চশর, তোমারি এ পরাজয়।
জাগো হে অতনু,
সখীরে বিজয়দূতী করো তব,
নিরস্ত্র নারীর অস্ত্র দাও তারে—
দাও তারে অবলার বল।। [১১]

মদনের উক্তিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নিরস্ত্র নারীর অস্ত্র, অবলার বল হল তার কটাক্ষশর।

নূতনরূপপ্রাপ্তা চিত্রাঙ্গদার উক্তির প্রথম বাক্যেই দৃষ্টিদ্যোতক ক্রিয়া: দেখা। এই নাটকে এই ক্রিয়াপদটির দ্বিতীয়বার প্রয়োগ। আমরা দেখেছি এর আগে এই ক্রিয়ার প্রয়োগ ঘটেছে সখীর উক্তিতে, একটি বিস্ময়বোধক বাক্যে। এবারেও এই প্রয়োগ বিস্ময়বোধক বাক্যে :

এ কী **দেখি**! [১২]

আমরা দেখেছিলাম চিত্রাঙ্গদার সেই "দেখা" ছিল তার আত্মদর্শন। তখন ছিল আত্মদর্শনের প্রথম পর্যায়— চিত্রাঙ্গদা প্রথম প্রত্যক্ষ করেছিল তাঁর নারীসত্তাকে। এবার সেই আত্মদর্শনের শেষ পর্যায়। প্রতিটি নারীর মধ্যে যে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে নিজের মধ্য দিয়ে সে তারই পূর্ণ রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করল।

মদনের বরে জয়ের অব্যর্থ অস্ত্র লাভ হল, কিন্তু জয়ের আনন্দ কোথায়? চিত্রাঙ্গদার নিজের কাছে নিজেকে পরাজিত মনে হয়। অর্জুনের "আঁখি ভুলাতে" এমনিভাবে ছলনার আশ্রয় নেওয়ায় আত্মগ্লানিতে ভারাক্রান্ত তার মন। তীব্র অপরাধবোধে জর্জরিতা নারী অদৃশ্য দয়িতের উদ্দেশে ক্ষমাপ্রার্থনা করে। সেই ক্ষমাপ্রার্থনাবাণীতে দৃষ্টিদ্যোতক বিশেষ্য "আঁখি"র পুনরাবৃত্তি :

এরে ক্ষমা কোরো সখা—
এ যে এল তব **আঁখি** ভুলাতে,
শুধু ক্ষণকালতরে মোহ-দোলায় দুলাতে
আঁখি ভুলাতে ।
মায়াপুরী হতে এল নাবি—
নিয়ে এল স্বপ্নের চাবি,
তব কঠিন হৃদয়দুয়ার খুলাতে
আঁখি ভুলাতে। [১৩]

চিত্রাঙ্গদার বক্তব্য থেকে স্পষ্ট তার এই প্রয়াসের লক্ষ্য "আঁখি" নয়, "আঁখি" উপলক্ষ্য মাত্র, প্রকৃত লক্ষ্য "হৃদয়"। "আঁখি ভুলানোর" এত আয়োজন, ইন্দ্রিয়সুখবিলাসের এই অধ্যায় প্রেমের সর্বশেষ পরিণাম নয়, এ শুধু অন্তর্বর্তী স্তর মাত্র। ভুমিকাতে উপস্থাপিত বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে, বারংবার "আঁখি ভুলানোর" প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে চিত্রাঙ্গদা যেন তার অপরাধ স্খালন করতে চায়।

চিত্রাঙ্গদার মত অর্জুনের উক্তিতেও দৃষ্টিদ্যোতক শব্দের প্রথম প্রয়োগ ঘটেছে প্রেমের উন্মেষের পর। প্রথম দেখায় অর্জুনের চোখে চিত্রাঙ্গদা ও তার সখীরা ছিল "বালকের দল"। তারপর চিত্রাঙ্গদা যখন তার সখীদের সহায়তায়, নারীর অশিক্ষিত পটুত্বে সাজসজ্জা করে অর্জুনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, তখন ব্রহ্মচারী অর্জুন তার মধ্যে দেখেছিল এক অতি সাধারণ নারীকে ; "বরাঙ্গনে" সম্বোধনটি ছিল শুধুই সৌজন্যসম্ভাষণ। অবশেষে মদনের বরদানের পর রূপান্তরিতা অলোকসুন্দরীকে দেখে সন্ন্যাসীর ব্রতবন্ধ ছিন্ন হয়ে গেল, সেইসময় বিস্ময়বিমুগ্ধ ব্রতচ্যুত সন্ন্যাসীর উক্তি :

কাহারে **হেরিলাম** [১৪]

"হেরা" ক্রিয়ার প্রয়োগ এই নাটকে তৃতীয়বার। অর্জুনের উক্তিতে এই ক্রিয়ার প্রয়োগের সঙ্গে চিত্রাঙ্গদার পূর্ববর্তী দুটি উক্তিতে ওই একই ক্রিয়ার প্রয়োগের মধ্যে একটা যোগসূত্র পাওয়া যায়। প্রথমে চিত্রাঙ্গদার উক্তিতে দেখা যায় ক্রিয়ার অনুজ্ঞারূপ (হেরো), তারপর সাধারণ অতীতের নঞর্থক রূপ (হেরিল না) এবং অর্জুনের উক্তিতে ক্রিয়ার সাধারণ অতীতের সদর্থক রূপটি (হেরিলাম)। হেরো— হেরিল না—হেরিলাম— একই ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে প্রথমে চিত্রাঙ্গদার স্বপ্ন, তারপর স্বপ্নভঙ্গ অবশেষে স্বপ্নপূরণ। লক্ষণীয় চিত্রাঙ্গদার উক্তিতে দুবারই ক্রিয়ার কর্ম "মুখ" কিন্তু অর্জুনের উক্তিতে এই কর্ম ব্যক্তিবাচক সর্বনাম "কাহারে" ; অর্জুন শুধু "মুখ"ই দেখে না, দেখে তার "অনিন্দ্যসুন্দর দেহলতা"। ক্রিয়ার কর্মের প্রয়োগ থেকে দেখা যাচ্ছে প্রাপ্তফল প্রত্যাশাকে অতিক্রম করে গেছে। তবু প্রেম এখনও শুধুই দৃষ্টির স্তরে, ইন্দ্রিয়চেতনার স্তরেই রয়েছে।

প্রেমের স্বপ্নমদির ভাবাবেশের মত প্রেমের দহনজ্বালারও প্রকাশ দুচোখে। নিবিড় আবেশঘন প্রথম পর্ব অতিক্রান্ত হতে সুতীব্র দাহ , প্রবল তৃষ্ণা গ্রাস করে অর্জুনের প্রাণমন। তার শরীরী অভিব্যক্তি অর্জুনের সতৃষ্ণ নয়নে। তারই প্রকাশ একাকী অর্জুনের গানে

বক্ষে জ্বালায় অগ্নিশিখা,
চক্ষে কাঁপায় মরীচিকা, [১৫]

এই আলোচনায় বিশেষ গুরত্বপূর্ণ চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুনের দ্বৈতসঙ্গীত: "কেটেছে একেলা বিরহের বেলা"। এই গানে "নয়ন" এর প্রয়োগ leitmotivএর মত।

কেটেছে একেলা বিরহের বেলা আকাশকুসুমচয়নে।
সব পথ এসে মিলে গেল শেষে তোমারি দুখানি **নয়নে**—
নয়নে, **নয়নে**।
দেখিতে দেখিতে নূতন আলোকে
কে দিল রচিয়া ধ্যানের পুলকে
নূতন ভুবন নূতন দ্যুলোকে মোদের মিলিত **নয়নে**—
নয়নে, **নয়নে**।
বাহির-আকাশে মেঘ ঘিরে আসে, এল সব তারা ঢাকিতে।
হারানো সে আলো আসন বিছালো শুধু দুজনের **আঁখিতে**—
আঁখিতে, **আঁখিতে**।
ভাষাহারা মম বিজন রোদনা
প্রকাশের লাগি করেছে সাধনা,
চিরজীবনেরি বাণীর বেদনা মিটিল দোঁহার **নয়নে**—
নয়নে, **নয়নে**।। [১৬]

এই গানে আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগের শেষে "নয়নে" এবং সঞ্চারীতে প্রতিশব্দ "আঁখিতে"র অবস্থান এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনবার প্রযুক্ত হয়েছে: নয়নে— নয়নে, নয়নে/আঁখিতে— আঁখিতে, আঁখিতে। দৃষ্টিদ্যোতক বিশেষ্যের প্রয়োগসংখ্যার মধ্যে যেন তৃতীয় নেত্রের উন্মীলনের সংকেত নিহিত রয়েছে।

গানটির বিভিন্ন অংশে দৃষ্টিদ্যোতক শব্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত পারিপার্শ্বিক শব্দাবলীর তুলনামূলক পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে এই পর্বে প্রেমের গতিপ্রকৃতির চিত্রায়ণ করা যেতে পারে।

তোমারি দুখানি **নয়নে**
মোদের মিলিত **নয়নে**
শুধু দুজনের **আঁখিতে**
মিটিল দোঁহার **নয়নে**

প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত একটি সম্বন্ধপদ। প্রথম দুটি ক্ষেত্রে সম্বন্ধপদ ও বিশেষ্যের মধ্যে অন্য একটি পদ রয়েছে। পরবর্তী দুটি ক্ষেত্রে সম্বন্ধপদ আর বিশেষ্যের মধ্যে কোন ব্যবধান নেই।

আস্থায়ীর শেষে মধ্যমপুরুষের সম্বন্ধপদের রূপটি ব্যবহৃত হয়েছে : তোমার। চারিচক্ষের মিলনে সমস্ত পথচলার অবসান, সমস্ত সাধনার সমাপ্তি তবু এখনও "আমি" আর " তুমি" দুটি স্বতন্ত্র সত্তা। তারপর অন্তরাতে "তোমারি"র সমান্তরাল অবস্থানে আসে "মোদের"। এবার "তুমি" আর "আমি" একই বন্ধনে বাধা পড়ে। আস্থায়ীতে সম্বন্ধপদ ও বিশেষণের মাঝে সংখ্যাবাচক শব্দ: দুখানি। "নয়ন" উপস্থাপিত গাণিতিক বাস্তবতায়। তারপর অন্তরায় প্রতিসম অবস্থানে আসে বিশেষণ "মিলিত"। সংখ্যার হিসাবের আর কোন গুরুত্ব থাকে না, সত্য হয় শুধু দৃষ্টির মিলন। মধ্যমপুরুষের একবচনের পর উত্তমপুরুষের বহুবচনের ব্যবহারে, সংখ্যাবাচক বিশেষণের পর মিলননির্দেশক গুণবাচক বিশেষণের ব্যবহারে প্রেমের মিলনমাধুরী নিবিড়তর হয়ে দেখা দেয়।

সঞ্চারীতে "আঁখি"র সঙ্গে যুক্ত প্রথম পুরুষের সম্বন্ধপদের রূপ: দুজনের। "আমি" "তুমি"র অস্তিত্বের এবার পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটে। উত্তম বা মধ্যমপুরুষের সঙ্গে প্রথমপুরুষের আর কোন ব্যবধান থাকে না। এই সম্বন্ধপদ বিশেষ্যের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত : আঁখিকে বিশেষিত করতে অন্য কোন সংখ্যাবাচক বা গুণবাচক শব্দের প্রয়োজন নেই । আঁখি "দুজনের" এটাই সত্য। সম্বন্ধপদের পূর্বে "শুধু" শব্দের অবস্থান এই দুজনকে বা দুজনের আঁখিকে পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। আঁখিতে আঁখিতে মিলন আরও নিবিড় হয়ে ওঠে।

সেই মিলন নিবিড়তম হয়ে ওঠে আভোগ অংশে। সঞ্চারীতে "আমি" "তুমি"র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে, তবুও সমাসবদ্ধ সম্বন্ধপদ "দুজনের" মধ্যে সংখ্যাবাচক "দুই"য়ের উপস্থিতির কারণে দুটি মিলনপিয়াসী সত্তার মধ্যে যেন অতিসূক্ষ্ম হলেও একটা ব্যবধান রয়ে গেছে। এবার রূপগতভাবে একবচনাত্মক একক সম্বন্ধপদ "দোঁহার" এর প্রয়োগে এই দুই সত্তার সম্পূর্ণ একাত্মতা সূচিত হয়।

আভোগ অংশে দৃষ্টির ভূমিকা বিশেষভাবে বিশ্লেষণযোগ্য। এই অংশে দৃষ্টি হয়ে ওঠে ভাষা— ভাবপ্রকাশের মাধ্যম। এই দৃষ্টির মিলনে ভাব ও ভাষার মধ্যে সব ব্যবধান ঘুচে যায়, প্রকাশবিহ্বলতার সব বাধা অতিক্রম করা যায়। এই প্রকাশমাধ্যমের প্রসঙ্গ পূর্ববর্তী দুটি গানে এসেছে। আমরা তার একটা সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা করব।

মদনের বরপ্রাপ্তা চিত্রাঙ্গদার প্রথম গানের সঞ্চারীতে ভাষা বা ভাবপ্রকাশমাধ্যমের প্রসঙ্গ প্রথম এসেছে। চিত্রাঙ্গদার অনুভূতিতে তার নবলব্ধ রূপলাবণ্য প্রতিভাত হয় এক নূতন ভাষারূপে। এই ভাষা অদৃশ্য প্রেমাস্পদের উদ্দেশে পত্ররচনার মাধ্যম হয়ে ওঠে :

সহসা মনে জাগে আশা,
মোর আহুতি পেয়েছে অগ্নির ভাষা
আজ মম রূপে বেশে লিপি লিখি কার উদ্দেশে,
এল মর্মের বন্দিনী বাণী বন্ধন নাশি। [১৭]

সদ্য অর্জিত এই ভাষা অবরুদ্ধ ভাবনার মুক্তি ঘটায়। কিন্তু পরবর্তী গানটিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বাণীর সেই বন্ধনমুক্তি শুধুই সাময়িক। এই গানের আভোগে দেখা যায় এই ভাষা হয়ে উঠেছে শুধুই কান্নার ভাষা— তখন সব বাণীই স্তব্ধ।

তরঙ্গ উঠে প্রাণে দিগন্তে কাহার পানে
ইঙ্গিতের ভাষায় কাঁদে— নাহি নাহি কথা।।[১৮]

রূপ ও বেশের সেই অগ্নিময়ী ভাষা শেষে অশ্রুবন্যাধারায় অবরুদ্ধ হয়ে যায়। শুধু গভীর দৃষ্টির ভাষাতেই ভাবের পূর্ণমুক্তি ঘটে। চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুনের দ্বৈতসঙ্গীতের শেষে "দোঁহার নয়নে"র আগে আসে ক্রিয়াপদ "মিটিল"। মিলিত নয়নের এই ভাষাতেই পূর্ণ পরিতৃপ্তি— এই ভাষাতেই "চিরজীবনের বাণীর বেদনার" চির অবসান ।

এর পরবর্তী পর্বে ইন্দ্রিয়সুখসম্ভোগ শুধুই অবসাদ জাগায়। গ্লানিভারাক্রান্ত হৃদয়ে অর্জুন এই মোহবন্ধন থেকে মুক্তি খোঁজে। এই সময়েই চিত্রাঙ্গদার প্রজাদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। তাদের মুখে মাতৃরূপিণী বীরাঙ্গনা সেই নারীর কথা শুনে বিস্মিত অর্জুন গভীর আগ্রহভরে তার নর্মসহচরীর কাছ থেকে "চিত্রাঙ্গদা রাজকুমারী" সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত জানতে চায়। ছদ্মরূপিণী চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের মন পরীক্ষা করার জন্য নিজের সঙ্গে সেই অন্বিষ্টা নারীর তুলনা করে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট হয় ; সেই নারীর প্রতি সে তাচ্ছিল্য ও ঘৃণা প্রকাশ করে। তার কৃত্রিম অহঙ্কার, কৃত্রিম ঘৃণার প্রকাশবাহী উক্তিতেও দৃষ্টির প্রাধান্য।

ছি ছি, কুৎসিত কুরূপ সে।
হেন **বঙ্কিম ভুরুযুগ** নাহি তার,
হেন **উজ্জ্বলকজ্জল আঁখিতারা**।
সন্ধিতে পারে লক্ষ্য কিণাঙ্কিত তার বাহু,
বিঁধিতে পারে না বীরবক্ষ **কুটিল কটাক্ষশরে**। [১৯]

নিজের রূপলাবণ্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে সে প্রথমেই অর্জুনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিজের "বঙ্কিম ভুরুযুগ", তার "উজ্জ্বলকজ্জল আঁখিতারা"র প্রতি। এইখানেই তার শ্রেষ্ঠত্ব, আর এখানেই "চিত্রাঙ্গদা রাজকুমারী"র পরাজয়। অস্ত্রচালনায় সুদক্ষ হলেও কটাক্ষশরচালনায় সে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। চিত্রাঙ্গদার এই উক্তি বরদানকালে মদনের উক্তিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়— যে উক্তিতে হৃদয়জয়ের যুদ্ধে নারীর মোহময়ী দৃষ্টির গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

এই পর্বে "কুটিল কটাক্ষশর" আর বীরবক্ষ বিদ্ধ করতে পারে না। "চিত্রাঙ্গদা রাজকুমারী"র যে অক্ষমতা নিয়ে নূতন রূপপ্রাপ্তা চিত্রাঙ্গদা তাকে ব্যঙ্গ করেছিল তা অর্জুনকে কোনভাবে স্পর্শ করে না । বরং তার যে গুণের কথা ছদ্মরূপিণী চিত্রাঙ্গদা নিতান্ত তাচ্ছিল্যভরে বলেছিল, সেই অস্ত্রচালনার পারদর্শিতার কথা শুনে অর্জুন বিস্ময়বিমুগ্ধ।

আগ্রহ মোর অধীর অতি—
কোথা সে রমণী বীর্যবতী ।
কোষবিমুক্ত কৃপাণলতা—
দারুণ সে, সুন্দর সে
উদ্যত বজ্রের রুদ্ররসে—
নহে সে ভোগীর **লোচনলোভা**,
ক্ষত্রিয়বাহুর ভীষণ শোভা।[২০]

তার সেই দশপ্রহরণধারিণী রুদ্রসুন্দর মূর্তিটি অর্জুনের মানসনেত্রে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। অন্তরের এই দেখার বিবরণ দিতে দৃষ্টিদ্যোতক কোন শব্দ ব্যবহৃত হয় নি। এই উক্তিতে ব্যবহৃত দৃষ্টিদ্যোতক শব্দ "লোচন"। দৃষ্টিদ্যোতক শব্দযুক্ত এই নঞর্থক বাক্যের উচ্চারণের মধ্য দিয়ে প্রেমের একটি পর্বের সমাপ্তি সূচিত হয়। সেই পর্ব ইন্দ্রিয়সুখসম্ভোগের। এখন অর্জুনের সৌন্দর্যচেতনা ইন্দ্রিয়দৃষ্টির সীমানা অতিক্রম করে গেছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহী শরীরী রূপলাবণ্য আর তার অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যপিয়াসী হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করতে পারে না।

অন্তরের অন্তস্তলে যার দেখা সে পেল, তাকে এবার বাইরে দেখার জন্য অর্জুনের প্রাণমন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তার পরবর্তী উক্তির শুরুতে দৃষ্টিদ্যোতক শব্দ "দেখা"।

যদি মিলে **দেখা** তবে তারি সাথে
ছুটে যাব আমি আর্তত্রাণে।
ভোগের আবেশ হতে
ঝাঁপ দিব যুদ্ধস্রোতে।
আজি মোর চঞ্চল রক্তের মাঝে
ঝন নন ঝন নন ঝঞ্ঝনা বাজে— বাজে----বাজে। [২১]

এই নাটকে অর্জুনের উক্তিতে প্রথম ব্যবহৃত দৃষ্টিদ্যোতক শব্দ ছিল "হেরিলাম"— যখন সে মায়ালাবণ্যময়ী চিত্রাঙ্গদাকে প্রথম দেখেছিল। সে দেখেছিল তার স্বপনচারিণীকে— সে দেখার বিবরণ দিতে গিয়ে প্রযুক্ত হয়েছিল কাব্যভাষার অন্তর্গত ক্রিয়া

"হেরা"। এবার অর্জুনের উক্তিতে শেষবারের মত দৃষ্টিদ্যোতক শব্দের ব্যবহার। এবার প্রযুক্ত হল গদ্যভাষার অন্তর্গত শব্দ "দেখা"। প্রথমে "হের্" ধাতুনিষ্পন্ন পদ, অবশেষে "দেখ্" ধাতু নিষ্পন্ন পদ— এর মধ্যে যেন নিহিত আছে স্বপ্নলোক থেকে রূঢ় বাস্তবে অবতরণের সঙ্কেত। কোন অবাস্তব মনোহর কল্পলোকবাসিনী রপে নয়, এখন অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকে দেখতে চায় দ্বন্দ্বসংঘাতমুখর বাস্তবের পটভূমিতে।

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বা ক্রিয়া "দেখা"র প্রয়োগ এর আগেও চিত্রাঙ্গদার সখীর উক্তিতে এবং স্বয়ং চিত্রাঙ্গদার উক্তিতে ঘটেছিল। দুটি ক্ষেত্রেই "দেখা"র ব্যবহার হয়েছিল বিস্ময়বোধক বাক্যে। অর্জুনের উক্তিতে "দেখা"র প্রয়োগ কিন্তু বিস্ময়বোধক বাক্যে নয়।

আমরা দেখেছি এই নাটকে দৃষ্টির সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে যুদ্ধের এক একটি পর্ব। চিত্রাঙ্গদার প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করার পর হৃদয়জয়ের যে যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল নূতন দৃষ্টির পর্বের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে চিরতরে তার অবসান ঘটে। এই যুদ্ধে অর্জুন সগৌরবে পরাজয় স্বীকার করেছিল, চিত্রাঙ্গদা জয়ী হয়েও জয়ের আনন্দ লাভ করতে পারে নি। অন্তরে বীরাঙ্গনা চিত্রাঙ্গদার রূপ দেখার পর ভোগের আবেশে নিমগ্ন অর্জুন আবার নূতন করে যুদ্ধস্রোতে ঝাঁপ দিতে চায়। এই যুদ্ধ বৃহত্তম অর্থে জীবনযুদ্ধের প্রতীক। এই যুদ্ধে অর্জুন চিত্রঙ্গদার মধ্যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখে না, দেখে তার সহযোদ্ধাকে।

অর্জুনের মানসিকতার এই বিবর্তনে অভিভূত চিত্রাঙ্গদা। সে অর্জুনকে আশ্বাস দেয় আজ অমারজনীর অবসানে কাল শুভ্র প্রভাতেই তার এই "দেখা"র আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে। এবার দৃষ্টিদ্যোতক শব্দ "দর্শন"এর প্রয়োগে এই দেখা এক ভিন্ন মাত্রা লাভ করে। বহুপ্রতীক্ষিত এই দেখা শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়দৃষ্টিসম্পাত নয়— এই দেখা মিথ্যার জাল ছিন্ন করে সত্যের প্রকাশ— এই দেখাতেই প্রেমের সাধনার অবসান। অর্জুনের প্রতি চিত্রাঙ্গদার আশ্বাস :

আজ অমাবস্যার রাতি হোক অবসান।
কাল শুভ শুভ্র প্রাতে **দর্শন** মিলিবে তার,
মিথ্যায় আবৃত নারী ঘুচাবে মায়া-অবগুণ্ঠন।[২২]

অবশেষে চিত্রাঙ্গদা মদনকে তার মায়ারূপলাবণ্য প্রত্যর্পণ করে। প্রেমের দেবতা শরীরী সৌন্দর্যের বর ফিরিয়ে নিয়ে নূতন বর দেন— প্রেমের সর্বোচ্চ প্রাপ্তির বর।

তাই হোক তবে তাই হোক,
কেটে যাক রঙিন কুয়াশা—
দেখা দিক শুভ্র আলোক
মায়া ছেড়ে দিক পথ,
প্রেমের আসুক জয়রথ,
রূপের অতীত রূপ
দেখে যেন প্রেমিকের **চোখ—**
দৃষ্টি হতে খসে যাক, খসে যাক মোহনির্মোক—
যাক খসে যাক, খসে যাক মোহনির্মোক ।।[২৩]

এবার নূতন দেখার পর্ব সমাগত। প্রেমবিমুখ শুষ্ক নয়নে প্রথম সঞ্চারিত রূপতৃষ্ণা অপনোদিত হয়েছে ; রূপের হাটে সব বিকিকিনি সারা হয়েছে। বহিরঙ্গ রূপের এই বিপুল আয়োজন ছিল রূপাতীতে উত্তরণের সোপান। রূপজ মোহমুক্ত দৃষ্টি আজ অরূপসুন্দরের প্রতীক্ষায়। "রূপের অতীত রূপ" দেখাই তো "সহজ সত্যের নিরলংকৃত মহিমায়" প্রেমের মুক্তি। যে যুদ্ধের আবহ এই নাটকে প্রচ্ছন্ন ছিল দৃষ্টির এই পর্বে মদনের উক্তিতে তার পূর্ণ অবসানের ঘোষণা। জয় চিত্রাঙ্গদারও নয়, অর্জুনেরও নয়। জয় হয় প্রেমের। তাই মদনের উক্তিতে বর্ণমদির মায়াকুহেলিজাল ছিন্ন করে প্রেমের জয়রথের আবির্ভাবের বার্তা ঘোষিত হয়।

এরপর শেষবার দৃষ্টিদ্যোতক শব্দ এসেছে সখীর উক্তিতে :

হে কৌন্তেয়,
ভালো লেগেছিল ব'লে
তব করযুগে সখী দিয়েছিল ভরি সৌন্দর্যের ডালি
নন্দনকানন হতে পুষ্প তুলে এনে বহু সাধনায়।
যদি সাঙ্গ হল পূজা

তবে আজ্ঞা করো, প্রভু,
নির্মাল্যের সাজি থাক্ পড়ে মন্দিরবাহিরে।
এইবার প্রসন্ন **নয়নে চাও** সেবিকার পানে।।[২৪]

বিশেষ্য "নয়ন" এবং ক্রিয়া "চাওয়া"— এই নাটকের শেষ তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টিদ্যোতক শব্দগুচ্ছ। এরপরেও একবার একটি সমবেত সঙ্গীতে ("তৃষ্ণার শান্তি")[২৫] দৃষ্টিদ্যোতক বিশেষ্য "চক্ষে" এসেছে, কিন্তু সেখানে রসের দিক থেকে নাটকের আর কোন অগ্রগতি হয় নি। প্রেমাস্পদের মনোহরণের এই পর্ব সখীর দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয়েছে যুদ্ধে জয়পরাজয় রূপে নয়, মায়াবিনী রমণীর মোহজালবিস্তাররূপে নয়, সাধনার এক পর্ব রূপে। একদিন আকস্মিকভাবে ভালোলাগা থেকে যার শুরু তার শেষ পরিণাম পূজা। এই পূজার চরম প্রাপ্তি পূজারিণীর প্রতি পূজিতের প্রসন্ন দৃষ্টিসম্পাত। সখীদের বিস্ময়-জাগানো চিত্রাঙ্গদার একদিনের "দেখা" থেকে যে আখ্যানের শুরু , অর্জুনের " প্রসন্ন নয়নে চাওয়াতে" তার সমাপ্তি।

প্রেমের সাধনায় দৃষ্টির সম্পূর্ণ বিপরীত ভূমিকা পরিলক্ষিত হয় "শাপমোচন" নৃত্যনাট্যে। এই দুই নাটকে দৃষ্টির ভূমিকার সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা দিয়ে আমরা এই নিবন্ধ সমাপ্ত করব। উভয় নাটকেই চরম লক্ষ্য এক— ইন্দ্রিয়চেতনার অন্তরালস্থিত সত্যে উত্তরণ— কিন্তু পথ ভিন্ন। "চিত্রাঙ্গদা" নাটকে ইন্দ্রিয়চেতনার সাময়িক পরিতৃপ্তির মধ্য দিয়ে গভীরতর অতৃপ্তি সৃষ্টি হয়— যা ইন্দ্রিয়াচেতনাতীতে উপনীত করে। পক্ষান্তরে "শাপমোচন" নাটকে ইন্দ্রিয়দৃষ্টি পূর্ণসত্যের উপলব্ধির পথে অন্তরায়। এখানে প্রেমের সাধনা ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে সাধনা। প্রেমাস্পদের দর্শনলাভে ব্যাকুল কমলিকাকে রাজা বলে, "আগে দেখে নাও অন্তরে, বাইরে দেখবার দিন আসবে তার পরে। নইলে ভুল হবে, ছন্দ যাবে ভেঙে।"[২৬] ঠিক বিপরীত পারম্পর্য "চিত্রাঙ্গদা" নাটকে। এখানে প্রথমে চোখের আলোয় চোখের বাহিরে দেখা, অন্তরে দেখবার দিন আসে তার পরে। একই প্রশ্ন দুই বিপরীত অবস্থান— ইন্দ্রিয়দৃষ্টি সম্বন্ধে দুই বিপরীত ভাবনার প্রতিফলন রবীন্দ্রচিন্তাবিশ্বের পরিব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যের পরিচয়বাহী।

উল্লেখপঞ্জী :

১) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ : অখণ্ড গীতবিতান, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০১৩, পৃ ৬৮৩
২) তদেব, পৃ ৬৮৭
৩) তদেব, পৃ ৭৩৮
৪) তদেব পৃ ৬৫৬
৫) তদেব, পৃ ৬৬৬
৬) তদেব, পৃ ৬৮৬
৭) তদেব, পৃ ৬৮৬
৮) তদেব, পৃ ৬৮৭
৯) তদেব, পৃ ৬৯২
১০) তদেব, পৃ ৬৯২
১১) তদেব, পৃ ৬৯০-৬৯১
১২) তদেব, পৃ ৬৯৩
১৩) তদেব, পৃ ৬৯৪
১৪) তদেব, পৃ ৬৯৪
১৫) তদেব, পৃ ৬৯৭
১৬) তদেব, পৃ ৬৯৮- ৬৯৯
১৭) তদেব, পৃ ৬৯৩
১৮) তদেব, পৃ ৬৯৪
১৯) তদেব, পৃ ৭০১
২০) তদেব, পৃ ৭০১

২১) তদেব, পৃ ৭০২
২২) তদেব, পৃ ৭০২
২৩) তদেব, পৃ ৭০৩-৭০৪
২৪) তদেব, পৃ ৭০৫
২৫) তদেব, পৃ ৭০৫
২৬) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শাপমোচন, রবীন্দ্ররচনাবলী, একাদশ খণ্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০১৩, পৃ ২৩৭

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

1. খাতুন, সনজীদা, রবীন্দ্রসঙ্গীত মননে লালনে, ঢাকা, নবযুগ প্রকাশনী, ২০১১
2. চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার, রবীন্দ্রসঙ্গীত-বীক্ষা : কথা ও সুর,কলকাতা, জিজ্ঞাসা,১৯৮৩
3. রায়, আলপনা (সম্পাদিত), রবীন্দ্রনাথের গান সঙ্গ অনুষঙ্গ, কলকাতা, প্যাপিরাস, ২০০১
4. রুদ্র, সুব্রত (সম্পাদিত), রবীন্দ্রসঙ্গীত চিন্তা, কলিকাতা, আশা প্রকাশনী,১৯৮০
5. সরকার, পবিত্র, রবীন্দ্রসঙ্গীতের এক সৃজনভিত্ত, *গানের ঝরনাতলায়,* কলকাতা,প্রতিভাস , ২০১৩
6. সেন, সুকুমার, রবীন্দ্রনাথের গান, কলিকাতা, টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, ১৯৮২

*****